KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

উদ্বাস্তু সমাজে বিকল্প পেশার উদ্ভব এবং প্রান্তিকতা থেকে মুক্তির চেষ্টাঃ নদিয়া জেলার অভিজ্ঞতা

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ

সার সংক্ষেপ:

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে নদিয়া জেলায় আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম, সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক অভিযোজন এই গবেষণার মূল বিষয়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হলেও বহু হিন্দু শরণার্থীর কাছে তা সর্বস্ব হারানোর শোক নিয়ে আসে। নদিয়া জেলা, বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় বিপুল উদ্বাস্তু প্রবাহ প্রত্যক্ষ করে। এদের মধ্যে নমঃশূদ্র, কৃষিজীবী ও তাঁতশিল্পে নিযুক্ত জনগোষ্ঠীর আধিক্য ছিল। এই সকল কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমবায় গঠনে সাহায্য করে, যা পরবর্তীতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সহায়ক হয়। এপ্রসঙ্গে নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচিত, কারণ দেশত্যাগ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথও উন্মুক্ত করে। তাঁতশিল্পে উদ্বাস্তুদের ভূমিকা নদিয়ার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে, বিশেষত ফুলিয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে তাঁতশিল্পের বিকাশ ঘটে। এছাড়া, নতুন পেশার অনুসন্ধান ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারে উদ্বাস্তুদের অবদান স্পষ্ট। সামগ্রিকভাবে, দেশভাগ নদিয়ায় একটি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্ম দেয়, যা উদ্বাস্তুদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে উদ্বাস্তু সমাজের সেই রূপান্তর প্রচেষ্টাকে গবেষণাধর্মী তথ্যের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

মূল শব্দ : উদ্বাস্তু, নদিয়া, পুনর্বাসন, শরণার্থী, তাঁতশিল্প, প্রান্তিকতা, পেশা

১৯৪৭ সাল যেমন ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনতা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণের বছর তেমনি এই বছরটি এক দল মানুষের কাছে তমসাচ্ছন্ন ছিন্নমূল জীবনে পদর্পনের বছরও বটে। দেশভাগের সূত্রে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে জীবন ও জীবিকা রক্ষার তাগিদে বাস্তুহারা মানুষ নিরন্তর এপার বাংলায় তাদের বসতি স্থাপন করতে থাকে। মূলত সাত দশক জুড়ে প্রান্তিক এই জন সমাজকে তাদের নয়া বসতিতে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে। যাদের একসময় গোলা ভর্তি ধান, পোষাপ্রাণী, পুকুর ভর্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি ছিল। 'অনেক কিছু'র থেকে এক নিমেষে রাজনৈতিক বিভাজনএর পরিণামে তারা সর্বশান্ত হয়ে, সর্বস্ব হারিয়ে, সর্বহারা হয়ে পড়ল। এই নিঃস্ব, রিক্ত মানুষগুলি পরিচিত হল শরণার্থী, উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল এবং 'রিফুউজি' নামে। যে-সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ছিল তারাই রাতারাতি রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বহারাতে পরিণত হয়ে ভূমিহীন মানুষে পরিণত হল। যাদের 'সব ছিল' তারা সব হারাল, অবশিষ্ট কিছুই থাকল না, দেশান্তরিত হতে হল নতুন স্থানে নতুন করে বসতি গড়ে তুলতে গিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হল। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়ল।

পূর্ব পাকিস্তান বা পরবর্তী কালে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে এই প্রান্তিক জনসমাজের অস্তিত্ব অধিক। সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলির মধ্যে আবার নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মালদহ ও দিনাজপুরে এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও নদিয়া এবং চব্বিশ পরগনা জেলাতে সর্বাধিক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বসতি দেখা যায়। এদের মধ্যে আবার অনেকাংশে ছিল তথাকথিত অন্ত্যজ, অব্রাহ্মণ, অবৈদিক শ্রেণির মানুষজন। বিশেষ করে নবশূদ্র বা নমঃশূদ্র শ্রেণিভুক্ত। এদের সঙ্গে ছিল অন্যান্য পিছিয়ে পড়া হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র কৃষক, হতদরিদ্র মজুর শ্রেণির মানুষ। এদের বাস ছিল শহর থেকে অনেক দূরে, বিলের ধারে, চরাভূমিতে কিংবা অত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। একই দেশের মাটিতে একই জলহাওয়া পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, তারা কখনো তাদের শত্রু ভেবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে সে চিন্তা এই মানুষগুলো বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। অত্যধিক দুঃখ-কষ্ট ও অসহায়তার মধ্যে পড়তে হয়েছিল এই মানুষগুলোকেই বেশি।[১]

নদিয়া জেলার এই প্রান্তিক জনসমাজের চর্চা প্রসঙ্গে ছিন্নমূল নারীর বা মানবীচর্চার প্রসঙ্গটিও অতি অবধারিতভাবে এসে পড়ে। মূলত দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে যারা নদিয়া জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গে বসতি গড়ে তুলেছিল তাদের সিংহভাগ ছিল নারী। প্রকৃতপক্ষে, দেশভাগ ছিল নারীদের কাছে অভিশাপ। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নারীরা নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে বাস্তুহারা হয়, দাঙ্গার শিকার হয়, খুন, নির্যাতনের শিকার হয়। সংখ্যাগুরুর দ্বারা অপহরণ, ধর্ষণ, জোর করে বিবাহ, যৌনদাসীত্ব, ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতিরও শিকার হয় সেখানকার সংখ্যালঘু নারী। অর্থাৎ অধিকাংশ বাঙালি উদ্বাস্তু নারীর দৃষ্টিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ছিল 'ধর্ষণ, অপহরণ কিংবা বলপূর্বক বিবাহের নামান্তর'।[২] অর্থাৎ এই প্রান্তিকৃত মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই নারী, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে এটাও ঠিক যে, দেশভাগের ফলেই নয়া বসতিতে জটিল, রুক্ষ জীবন যুদ্ধে নেমে নারীদের জীবনে আমুল পরিবর্তন এসেছিল। দেশভাগ নারীদের জীবনের উত্তরণের দরজা খুলে দেয়। দেশভাগের পরিস্থিতি এই জেলায় নারীকে গৃহের দরজা অতিক্রম করে বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে শিখিয়েছে। সেই সঙ্গে তারা নিজেরা এবং নিজের সংসারকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে শিখেছে। অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে যে হিন্দু নারী গৃহের অন্তরালে জীবন কাটিয়ে দিত, উদ্বাস্তু জীবনে সেই নারীরা এপার বাংলায় এসে গৃহের বাইরে বেরিয়ে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করতে শিখেছে, শ্রমিকের কাজ করতে গৃহের বাইরে কলকারখানায় ছুটেছে, কর্মমুখী হয়েছে।[৩] বাঙালি উদ্বাস্তু নারীর এই পরিবর্তনকে বামপন্থী নেত্রী মণিকুন্তলা সেন ' অদ্ভুত জাগরণ' হিসেবে দেখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পূর্ববঙ্গ থেকে না এলে হয়তো বাঙালি নারীর এই পরিবর্তন হত না। এই পরিবর্তনের ফলে নদিয়া জেলায় আগত বাস্তুহারা মানুষগুলি সেই দুর্দিনে যেমন পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে, তেমনি প্রান্তিক নারীমুক্তির নানা প্রকার পথও খুলে গিয়েছে।

নদিয়া জেলায় এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের নানাবিধ কারণ আছে। প্রথমত-পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের ক্ষেত্রে যে বর্ডারগুলি ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দর্শন ও বেনাপোল। দর্শনা বর্ডারটি নদিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। তাই দর্শনা বর্ডার দিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীরা অতি সহজে নদিয়া জেলার গেদে স্টেশনে আসতে সক্ষম হত। এখান থেকে নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত। দ্বিতীয়ত- পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা দেশত্যাগের পর সীমান্তের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। আর সেই কারনে সীমান্তবর্তী এই জেলটিকে তারা বেছে নেয়। তৃতীয়ত - ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর সরকারিভাবে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়। এর ফলে পাসপোর্ট এর সুবিধা নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে নির্যাতিত সংখ্যালঘু হিন্দু এপার বাংলারা আসতে থাকে। তাদের হাতে সঞ্চিত অর্থ কম ছিল বলে সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে বসতি স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা সীমান্তবর্তী নদিয়া জেলাতে থাকার চেষ্টা করেছিল। চতুর্থত এই অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী। তাই পশ্চিমবঙ্গে এমন এলাকাতেই থাকতে চাইত যেখানে

অনন্ত কৃষি জমি সহজলভ্য। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে নদী বাহিত পলি সমৃদ্ধ উর্বর জমির পরিমাণ নদিয়া জেলায় বেশি ছিল। সেই কারণে এখানে ছিন্নমূল প্রান্তিক এই মানুষজন বসবাসের চেষ্টা করে। কিছু ক্ষেত্রে তারা নিজেরা দেশত্যাগে ইচ্ছুক মুসলিমদের সাথে সম্পত্তি বিনিময় করেও নদিয়া জেলায় বসবাস করতে থাকে।[৪]

দেশভাগের মূহুর্তে যে সকল উদ্বাস্তু নদীয়াতে এসেছিল তারা মূলত অকৃষিজীবী।[৫] ১৯৫৬ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে এই পর্যন্ত উদ্বাস্তুর শতকরা হার ছিল নিম্নরূপঃ[৬]

সারণীঃ ১

পেশাগত ক্ষেত্র	শতকরা হার
কৃষিজীবী	২৮%
চাকুরীজীবী	২৬%
ব্যবসায়ী	১৮%
ক্ষুদ্র শিল্প	৯%
ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতা	৫%
দিনমজুর	৫%

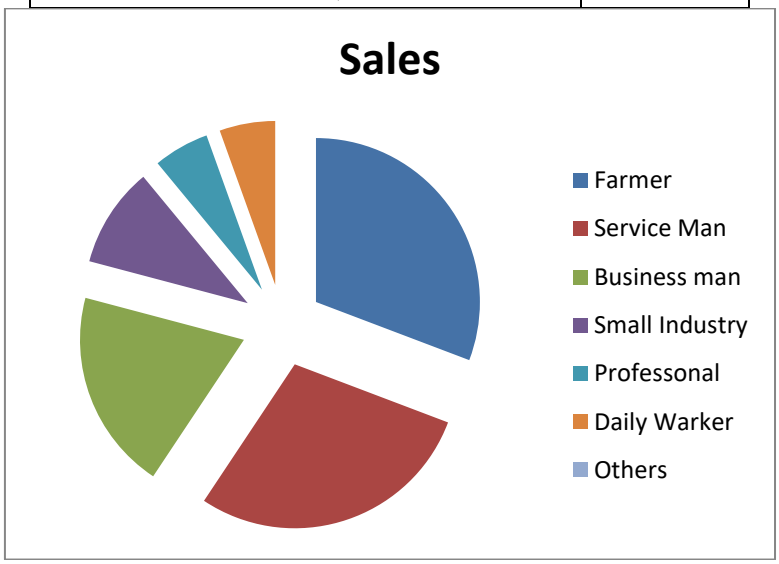

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ কালপর্বে নদীয়া তথা পশ্চিমবঙ্গে যে সকল উদ্বাস্তু এসেছে তাদের অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর হলেও তাঁতি, ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীও ছিল, যাদের জমির সাথে সেভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ এর পরে যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করে এসেছে তাদের প্রায় সমগ্র অংশই ছিল কৃষক শ্রেণীভূক্ত।

নদীয়ায় আগত উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশ হল নিম্নবর্ণের কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। পূর্ববঙ্গে তাদের অনেকেই ছোট বা মাঝারি মাপের কৃষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ফলত গ্রামীন কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারনেই তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যায়গা তৈরী হয়েছিল আর সেই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা পরবর্তী কালে উদ্বাস্তু জীবনে এসে তাদের চরম আর্থিক সংকটের মধ্যেও পারস্পরিক সহমর্মীতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রটি তৈরী করে। আতি সামান্য প্রয়োজন যেমন দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিওর অনুষ্ঠান কিম্বা ঘড়ি দেখে সময় নির্দ্ধারনের মতো বিষয়গুলিতেও উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে অংশ গ্রহন করত।[৭] এই সকল ছোটো ছোটো বিষয়গুলিতে তাদের পারস্পরিক বোঝাপাড়া পরবর্তীতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যপক ভাবে সমবায় গঠন ও সমবায় আন্দোলনে সফল করে তোলে। কারন সমবায় ব্যবস্থার মূল কথায় হল পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরশীলতা। জবর দখল কলোনি প্রতিষ্ঠা থেকে তার আর্থিক উন্নয়ন, সকল ক্ষেত্রে এই সমবায় এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এই বাস্তুহারাদের মধ্যে প্রধানত ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ভূক্ত নিম্নবর্নের হিন্দু। এরা মূলত কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি নদীবহুল পূর্ববঙ্গে মাঝি, মৎসজীবী, ছুতোরের পেশাতেও অনেক নমঃশূদ্র যুক্তছিলেন। বর্ণ হিন্দুদের থেকে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য আর্থিক দিক থেকেও পৃথক করে দিয়েছিল।[৮]

নদিয়ায় যথেষ্ট সংখ্যায় এই নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তু আগমন ও বসতি স্থাপনের ফলে ১৯৬১ সালের মধ্যে নদীয়ার কৃষিজীবী জনসংখ্যার পরিমান বেড়ে দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশ। ঐ সময়ে এই সংখ্যাটি গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তুলনায় ছিল যথেষ্ট বেশি। পশ্চিমবঙ্গে তখন কৃষিজীবী জনসংখ্যা ছিল ৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে নদীয়ার মোট কৃষিজমির মধ্যে কর্ষিত জমির পরিমানও এই সময় কমে দাঁড়ায় ২১,৮০০ একর।[৯]

নদীয়া শিল্প প্রধান জেলা নয়। এই কারনে নদীয়ায় বৃহৎ শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো গ্রহন করা কখনোই সম্ভব ছিলনা। কিন্তু নদীয়ায় দেশভাগের পরিনামে ছিন্নমূল হয়ে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে শিল্পের উপর বিশেষত, তাঁত বস্ত্র শিল্পের উপর নির্ভর মানুষের সংখ্যা কম নয়। এই সকল শিল্পজীবী উদ্বাস্তুদের সঠিক ও সার্বিক পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল নদীয়াতে তাঁত শিল্পের বিকাশ। নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের বসতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উদ্বাস্তুদের হাত ধরে তাঁত শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছিল।

দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে রানাঘাটে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁত শিল্পের অস্তিত্ব চোখে পড়ত না।[১০] কিন্তু দেশভাগের পরেই রানাঘাটের কলোনি এলাকায় চিত্তরঞ্জন তাঁতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[১১] কুপার্স ক্যাম্প ও রূপশ্রী কলোনিতে উদ্বাস্তুদের দ্বারায় তাঁতের প্রসার ঘটেছিল। হরিনঘাটা ব্লকে এক শ্রেনীর উদ্বাস্তু তাঁত শিল্পকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেয় এবং পরবর্তীকালে তাঁতকে কেন্দ্র করে তারা সাফল্য লাভে সচেষ্ট হয়। কাচড়াপাড়া-জাগুলি সড়কের পাশে বহু তাঁতি তাঁতের সুতো কাটার জীবিকা গ্রহন করেছে। এদের অনেকে পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা মানুষ।[১২]

নদীয়ার উত্তরাংশে কৃষ্ণনগর থেকে ৪৯ মাইল দূরে করিমপুর ব্লকের মহিষবাথান পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলিতে উদ্বাস্তুদের দ্বারা তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে। এখানে তাঁত সিল্প গড়ে উঠেছে ১৯৭০এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ফুলিয়া, হবিবপুরের মিত্র-বসাক তাঁতি পরিবারের আত্মীয়তার সূত্র ধরে এখানে তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে।[১৩]

মহিষবাথানে রবীন্দ্রপল্লী, তাঁতীপাড়া, কড়ইতলাপাড়া, সুকান্তপল্লী, উপানন্দ কলোনির বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এরা পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং টাঙ্গাঈল তাঁত কাপড় বোনেন। অপরদিকে এই ব্লকের একটা বড় অংশ রাজবংশী ('বিশ্বাস' পদবিধারী) উদ্বাস্তুরা স্থানীয় বিল, পুকুর ও নদীতে মৎস চাষের সাথে যুক্ত হয়েছে। আবার তেহট্ট ব্লকের উদ্বাস্তু তাঁতিরা জ্যাকার্ড কাপড় বোনেন।[১৪]

কৃষ্ণনগরের কাছে জেলা তথা রাজ্যের সবথেকে বড় উদ্বাস্তু ক্যাম্প ছিল ধুবুলিয়া ক্যাম্প। এই উদ্বাস্তু ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে তাঁতিপাড়া, দীপচন্দ্রপুর, শরৎপল্লী, ধুবুলিয়া ৩নং প্রভৃতি কলোনি গড়ে ওঠে। এই কলোনিগুলির বাসিন্দাদের অনেকেই টাঙ্গাঈল তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত। কৃষ্ণনগরের দক্ষিনে জালালখালি গ্রামে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুর বসবাস যারা অনেকেই তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত।[১৫]

পূর্ববঙ্গের প্রচুর সংখ্যক সুদক্ষ কারিগর ফুলিয়া কলোনি এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। সরকারী পুনর্বাসন দপ্তর থেকে তাদের তাঁত সরঞ্জাম কেনার জন্য ১২০০ করে টাকা দেওয়া হয়। অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে মহাজন শ্রেনীর একটি অংশ সস্তা দরে জমি কিনে পরবর্তীতে অন্যান্য উদ্বাস্তুদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে এবং অগ্রিম অর্থ দিয়ে তাদের তাঁতের পেশায় নিযুক্ত করে। এইভাবে দেশভাগের পর প্রায় প্রতিবছর ফুলিয়ায় তাঁতি ও তাঁতের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রতিযোগিতার ফলে কাপড়ের গুনমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁত বস্ত্রের গুনমান ও চাহিদা

বৃদ্ধির সাথে ফুলিয়া-শান্তিপুরে স্থানীয় স্তরে বস্ত্র বাজার গড়ে উঠেছে। সূত্রাগড়ের হাট, বাগআঁচড়ার হাট, বহিরগাছির হাট প্রভৃতির সূচনা কিন্তু এই চাহিদা বৃদ্ধির সূত্রে।[১৬] বর্তমানের ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ তাঁতি উদ্বাস্তু। শান্তিপুরেও মূল শহরের বাইবের এলাকায়বহু উদ্বাস্তু এই তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত। হবিবপুরের দুর্গাপুর গ্রামে রাজবংশী কৃষিজীবী সম্প্রদায় তাদের পারিবারিক চাষাবাদ বন্ধ করে তাঁতের পেশা গ্রহন করেছে।

উদ্বাস্তুদের হাত ধরে নদীয়ায় তাঁত শিল্প উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুসারে নদীয়ায় মোট জনংখ্যার ৭.৫৭ শতাংশ মানুষ তাঁত পেশার উপর নির্ভরশীল (যেখানে কৃষিকাজে নিযুক্ত জনসংখ্যা ১৬.৩৭ শতাংশ)। শুধুমাত্র ১৯৯০ এর দশকে নদীয়ায় তাঁতির সংখ্যা বেড়েছে ৫৯.৯ শতাংশ। ১৯৮০ দশক থেকে তাঁতির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষটি লক্ষ্য করা যায়।[১৭]

নদীয়ায় উদ্বাস্তুর অর্থনৈতিক পরিচিতি কৃষি বা শিল্প ক্ষেত্র থেকেও বেশি করে গুরুত্ব লাভ করে নতুন নতুন পেশার নির্মানের মধ্য দিয়ে। পূর্ববঙ্গে যারা কৃষি কাজে যুক্ত ছিলেন, এপার বাংলায় তাদের অনেকেই কৃষিকাজের জমি পাননি। তারা জমি হারিয়ে কৃষি মজুর, যারা মৎসজীবী ছিলেন তারা মাছের ফেরিওয়ালা, যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন তারা কর্মচারীর পেশা গ্রহন করেন। আবার নায়েব, চিকিৎসক, শিক্ষক, উকিল ইত্যাদি পেশাগত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে সকল সদস্য দেশ ত্যাগ করেছিল তারা আর তাদের নয়া বসতিতে পূর্বতন পেশাকে কেন্দ্র করে আর সাফল্য আনতে পারেনি।[১৮] এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন ছিল নতুন পেশার অনুসন্ধান।

আসলে উদ্বাস্তু হয়ে প্রবল অর্থসংকটের মুখে পড়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। গ্রামের তথাকথিত বিভিন্ন বন্য শাক-সব্জী, মানকচু, কচুর লতি, নলতে শাক, শালুক ফুল বাজার জাত হয়েছিল উদ্বাস্তুদের হাত ধরে।[১৯] মফস্বলে বা শহরে উদ্বাস্তুরা বেছে নিয়েছিল ফেরীওয়ালা বা হকারীর পেশা। গামছা, ধুপকাঠি, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন, বই, পেনসিল, ফল এই সকল দ্রব্য যা সাধারণত বাজারে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পাওয়া যায় সেগুলিকে ক্রেতার বাড়িতে, অফিসে, ট্রামে-বাসে অবসর সময়ে পৌছে দেওয়ার অভিনব কৌশলের মধ্যে দিয়ে এই পেশার নির্মান সম্ভব হয়ে ওঠে।[২০] নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে ‘সুবর্ণজয়ন্তি স্মারক গ্রন্থ’ থেকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই রূপ পেশা গ্রহনের প্রমান পাওয়া যায়। দেখা যায় মেহেরপুরের জমিদার পরিবারের সন্তান অমিয় ব্যানার্জী রানাঘাটে এসে গামছার ফেরী করতে শুরু করে।[২১]

অন্যদিকে বাদকুল্লা, তাহেরপুর, আরংঘাটা এলাকায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা কৃষিকাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন তাদের মধ্যে ধান থেকে চাল প্রস্তুত করার পেশা গ্রহন করতে দেখা যায়। পূর্বে ধান থেকে চাল প্রস্তুতের সম্পূর্ণ কাজটি কৃষি পরিবারের ধারাবাহিক কাজের অংশ হিসাবে বিবেচিত হলেও উদ্বাস্তুদের হাত ধরে ‘ধান সিদ্ধ’ নতুন পেশার পরিচিতি লাভ করে। আবার কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের বিভিন্ন পেশা গ্রহন করতে দেখা যায়।

তেহট্ট থানার বেতাই ইউনিয়নে এভাবে ১৯৫৪ সাল থেকে গড়ে উঠেছিল হকার্স কর্নার, যা মূলত সংশ্লিষ্ট বেতাই, হরিপুর, নাজিরপুর এলাকার উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। প্রধান রাস্তার সংলগ্ন PWDর জমিতে এই প্রকার দোকান দেখা যায়।[২২]

নদীয়ার উদ্বাস্তু আধিক্য সেই সূত্রে কৃষি ও শিল্পে কর্মসংস্থানের সংকট এভাবেই নতুন পেশা নির্মানের মধ্যদিয়ে সমাধানের বিকল্প পথের অনুসন্ধান করে।

উদ্বাস্তু আগমনের একটা বড় ফল ছিল পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কলকাতা, চব্বিশ পরগনা ও নদীয়ার শহরতলি অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন। শ্লথ গতির পরিবহনের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বহু লোকালয় সড়ক পথের দ্বারা যুক্ত হয়, বহু পথে লোকসমাগম শুরু হয়। এই সকল লোকালয়ের ও পথের ধারে ছোটো দোকান এবং পরিবহনের কাজে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু যুক্ত হয়।[২৩]

এরই পাশাপাশি নদীয়ার অর্থনীতিতে আরও একটি ধারার সূচনা হয়। বর্তমানে যে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর পরিচয় পাওয়া যায় তার উদ্ভব হয়েছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাস্তুচ্যুত উদ্যোগী মানুষদের হাত ধরে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যুব আন্দোলনের একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল এই উঠতি মধ্যবিত্তরা।[২৪] উদ্বাস্তু আন্দোলন, বিভিন্ন দাবীদাওয়াকে ভিন্ন পথে চালিত করতে মধ্যবিত্তদের স্বউদ্যোগ একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল উদ্বাস্তুদের মধ্যে পুনর্বাসন, ডোল, ঋণের দাবী ছেড়ে সুস্থ্য বিকাশের পথ করে নিতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তবে সার্বিক ভাবে বলাযায় বিভাগ উত্তর নদীয়া জেলায় ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমন, সেই সূত্রে স্বাভাবিক জনসংখ্যর সঙ্গে অত্যাধিক উদ্বাস্তু জনসংখ্যার চাপ, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে কর্মহীনতা, বিকল্প পথে পেশার সন্ধানের মধ্যেও বলা যায় সাধারণ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নদীয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কাম্য সাফল্য আনতে পারেনি। এই কারনে শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য, কৃষিক্ষেত্রে দৃশ্য-অদৃশ্য বেকারত্ব ও দারিদ্রতা ক্রমশ বেড়েছে। GDPর হার বাড়লেও নিম্নবর্ণভূক্ত মানুষের দারিদ্রের হার বেড়েছে।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বাস, শরৎ চন্দ্র. *নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আত্মকথা.* ২য় খণ্ড, প্রকাশিকা শ্রীমতী শীলারাণী বিশ্বাস, সগুনা, নদীয়া, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১০১

২. দাশগুপ্ত অভিজিৎ; *বিস্থাপন ও নির্বাসন: ভারতে রাষ্ট্র- উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৯

৩. হীরা আশীষ কুমার; *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু নারী,* জলাক, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৮

৪. বিশ্বাস সুভাষ ; *দেশভাগ ও বাঙালি বাস্তুহারা*; দিশা প্রকাশন; কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা ১২০

৫. Amritabazar Patrika, 20 October, 1947

৬. ৫ আগষ্ট, ১৯৫৬; স্বাধীনতা; পৃষ্ঠা ৪

৭. http://bangalnama.com; মজুমদার সমরজিৎ; *পূর্বপাকিস্থানের উদ্বাস্তু-সংস্কৃতির সংঘাত*; ডিসেম্বর, ২০১০

৮. মামুন মুনতাসীর, *বাংলাদেশ বাঙালীমানসঃ রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, কৃষ্টি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ২০১২, পৃঃ ৪৩

৯. সিংহ অনিল, *পশ্চিমবঙ্গের জবরদখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, কলকাতা বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৫; পৃঃ ১০৭

১০. Samaddar Ranbir, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal, Sage*, New Delhi, 1999; p19

১১. Majumdar Durgadas, *West Bengal Dist. Gazetteers: Nadia*, April, 1978, p160

১২. বিশ্বাস সুজিত, *তাঁতশিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা (১৯৪০-২০০৭)*, অরুণা, কলকাতা, ২০০৯; পৃঃ ১১

১৩. বিশ্বাস সুজিত, *তাঁতশিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা (১৯৪০-২০০৭)*, অরুণা, কলকাতা, ২০০৯; পৃঃ ১১

১৪. সাক্ষাৎকারঃ বসাক সঞ্জয়, পেশা শিক্ষকতা এবং তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ী, ফুলিয়া, ২।২।২০১৩

১৫. বিশ্বাস সুজিত, *তাঁতশিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা (১৯৪০-২০০৭)*, অরুণা, কলকাতা, ২০০৯; পৃঃ ১৪

১৬. বিশ্বাস সুজিত, *তাঁতশিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা (১৯৪০-২০০৭),* অরুণা, কলকাতা, ২০০৯; পৃঃ ১৫

১৭. দাস অজিত; *দেশবিভাগ ও নদীয়া;* মহাপাত্র অশোক সিংহ ও কুণ্ডু অপুর্ব, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মারক গ্রন্থ (১৯৫৫-২০০৫), নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, নদীয়া, ২০১০; পৃঃ ৮৭-৮৮

১৮. ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭; স্বাধীনতা; পৃষ্ঠা ৫

১৯. Census Report; 1971; Nadia
২০. বন্দ্যোপাধ্যায় কৌশিক; *বামহালীর ফুটবলে ঘটি-বাঙালঃ ক্রীয়া ক্ষেত্রে একটি সামাজিক দ্বন্দ্ব;* ইতিহাস অনুসন্ধান; ২০তম; পঃ বঃ ইঃ সঃ; কলকাতা; পৃঃ ৪৯৭
২১. দা রবি; *নবগঙ্গা থেকে আদিগঙ্গাঃ ভুঁইফোড়দের সুলুক সন্ধানঃ পর্ব দুই;* Posted by http://bangalnama.com; date 22/12/2010
২২. ১২ নভেম্বর, ১৯৫৩; স্বাধীনতা এবং ১৫ জানুয়ারী, ১৯৫৭; স্বাধীনতা; পৃষ্ঠা ৬
২৩. গোস্বামী ড. প্রদ্যোত কুমার; *স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নদীয়ার অর্থনৈতিক চিত্র;* মহাপাত্র অশোক সিংহ ও কুণ্ডু অপুর্ব, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মারক গ্রন্থ (১৯৫৫-২০০৫), নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, নদীয়া, ২০১০; পৃঃ ১৩
২৪. ৩০ জুলাই ও ৩০ নভেম্বর, ১৯৫৭; স্বাধীনতা পত্রিকা; পৃষ্ঠা ৫